ভূমিকা

শিষ্ট বা সাহিত্যিক বাংলাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে বাংলা ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা বিশ শতকের '৭০'এর দশকে এসে আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারলেও যে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। কিন্তু এই জাতীয় গবেষণায় বাংলার উপভাষাসমূহ যে সমুচিত গুরুত্ব পায়নি এ কথাও স্বীকার না করে উপায় থাকে না। স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসনই সম্ভবতঃ এই ধারার প্রথম পথিকৃৎ। তাঁর 'লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া' গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডের প্রথম অংশে সংক্ষিপ্ত ভাবে হলেও বাংলা উপভাষাগুলোর পরিচয় বিধৃত হয়েছে। গ্রীয়ারসনের পরেও একাধিক গবেষক বিক্ষিপ্ত ভাবে বাংলার একাধিক উপভাষা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই বিষয়ে বিধিবদ্ধ এবং পূর্ণাঙ্গ আলোচনার অভাব পূরণ হয়নি।

গ্রীয়ারসন বা তৎপরবর্তী গবেষকদের এই বিষয়ক সমস্ত গবেষণা-কর্মের পর্যালোচনা বা মূল্যায়ন স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। তাই একমাত্র ঐতিহাসিক তথ্যের খাতিরে এই জাতীয় কতিপয় প্রতিনিধিস্থানীয় গবেষণা-কর্মের একটি কালানুক্রমিক সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে উপস্থাপিত হ'ল -

(১) জি, এ, গ্রীয়ারসন	নোটস্ অন দি রংপুর ডায়লেক্ট, জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ভল্যুম-৪৬, পার্ট-১, নাম্বার-৩, ১৮৭৭, পৃঃ ১৮৬-২২৬
(২) সুরেন্দ্র চন্দ্র রায় চৌধুরী	রংপুরের দেশীয় ভাষা, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, প্রথম সংখ্যা, ১৩১২ বঙ্গাব্দ
(৩) পূর্ণেন্দু মোহন সেহানবিশ	কামতাবিহারী ভাষা সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ
(৪) যতীন্দ্র মোহন চৌধুরী	রংপুর ভাষার ব্যাকরণ, রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, প্রথম-চতুর্থ সংখ্যা, ১৩২০ বঙ্গাব্দ
(৫) গোপাল হালদার	এ ব্রিফ ফোনেটিক স্কেচ অব দি নোয়াখালি ডায়লেক্ট অব সাউথ ইস্টার্ন বেঙ্গলী, জার্নাল অব দি ডিপার্টমেন্ট অব লেটার্স, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, ভল্যুম-১৯, ১৯২৯
(৬) গোপাল হালদার	এ স্কেলিটন গ্রামার অব দি নোয়াখালি ডায়লেক্ট অব বেঙ্গলী, জার্নাল অব দি ডিপার্টমেন্ট অব লেটার্স, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, ভল্যুম-২৩, ১৯৩৩

(৭) মুহম্মদ এনামুল হক	চট্টগ্রামী বাঙালার রহস্য ভেদ, চট্টগ্রাম, ১৯৩৫
(৮) এস, পি, চৌধুরী	নোটস্ অন দি রংপুর ডায়লেক্ট্, ইন্ডিয়ান লিঙ্গুইস্টিক্স্, ভল্যুম -৭, ১৯৩৯
(৯) কৃষ্ণপদ গোস্বামী	লিঙ্গুইস্টিক নোটস্ অন ময়মনসিং ডায়লেক্ট্, ইন্ডিয়ান লিঙ্গুইস্টিক্স্, ভল্যুম-৭, ১৯৩৯
(১০) এস, পি, চৌধুরী	নর্থ বেঙ্গল ডায়লেক্টস্ : রাজশাহী, ইন্ডিয়ান লিঙ্গুইস্টিক্স্, ভল্যুম-৮, ১৯৪০
(১১) কৃষ্ণপদ গোস্বামী	লিঙ্গুইস্টিক নোটস্ অন চিটাগাং বেঙ্গলী, ইন্ডিয়ান লিঙ্গুইস্টিক্স্, ভল্যুম-৮, ১৯৪০
(১২) ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়	পুরুলিয়া জেলার গ্রাম্য ভাষাতত্ত্ব, পুরুলিয়া, ১৯৫৯
(১৩) শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী	সিলেটি ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, ঢাকা, ১৯৬১
(১৪) ডঃ সুধীর কুমার করণ	সাম আসপেক্টস্ অব সীমান্ত রাঢ়ী ডায়লেক্ট্, বি, পি, এস, পি, ক্যালকাটা, ভল্যুম-৪, পার্ট-১, ১৯৬৩
(১৫) গুণবেশ সিংহ রায়	এ সিকসথ্ ডায়লেক্ট্ অব বেঙ্গলী, বি, পি, এস, পি, ক্যালকাটা, ভল্যুম-৪, পার্ট-২, ১৯৬৩
(১৬) বিজন বিহারী ভট্টাচার্য্য	দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার উপভাষা, বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম বর্ষ, ১৯৬৮
(১৭) ডঃ নির্মল দাশ	উত্তরবঙ্গের বাহীর ভাষা, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বিশ্বভারতী, ১৯৭০
(১৮) ডঃ নির্মল দাশ	উত্তরবঙ্গের উপভাষার ঐতিহাসিক গুরুত্ব, মধুপর্ণী, বালুরঘাট, উত্তরবঙ্গ সংখ্যা, ১৯৭৭
(১৯) ডঃ সুধীর কুমার করণ	"রাজবংশী" লোকভাষা ও "দক্ষিণ-পশ্চিমী বাঙলা", মধুপর্ণী, বালুরঘাট, উত্তরবঙ্গ সংখ্যা, ১৯৭৭
(২০) সুধাংশু শেখর তুঙ্গ	বেঙ্গলী অ্যান্ড আদার ডায়লেক্টস্ অব দি ডিষ্ট্রিক্ট্ অব কাছাড়, গৌহাটি ইউনিভারসিটি, ১৯৭৭ (অপ্রকাশিত গবেষণা নিবন্ধ)
(২১) ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক	প্রান্ত উত্তরবঙ্গের উপভাষার পর্যায়, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, কলকাতা, ১৯৭৮

লক্ষণীয় যে উপরে প্রদত্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ এবং গ্রন্থাবলীর আলোচনা কোনো কোনো উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার কোনো একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোনো একটি উপভাষার পূর্ণাঙ্গ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় এগুলিতে বিধৃত হয়নি। অথচ একটি ভাষার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তুলে ধরতে হলে তার উপভাষাগুলোর সম্যক পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। বিশেষ ভাবে উত্তরবঙ্গের উপভাষা সম্পর্কে ভাষা-বিজ্ঞান সম্মত আলোচনার বিষয়টি যে এ পর্যন্ত উপেক্ষিত উপরের তালিকায় তা ও স্পষ্ট

ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় 'দি ওরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অব দি বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ' (রূপা অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ১৯৭৫) এবং ডঃ সুকুমার সেন 'ভাষার ইতিবৃত্ত' (ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৫) গ্রন্থে বিষয়টি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত দিয়েছেন মাত্র। উপেন্দ্র নাথ বর্মণ এবং ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল মহাশয় যথাক্রমে 'রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস' (জলপাইগুড়ি, ১৯৬৬) গ্রন্থের ভাষা খণ্ডে এবং 'দি রাজবংশীজ অব নর্থ বেঙ্গল' গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে উত্তরবঙ্গের উপভাষার রূপ-ও রেখা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু গ্রন্থকারদ্বয়ের মনোযোগ বিষয়ান্তরে নিবদ্ধ থাকার ফলে বিশেষ ভাবে এই বিষয়টির উপরে গুরুত্ব আরোপ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ব্যাপ্তি এবং ভাষা-তত্ত্বের বিচারে এই দুজনের আলোচনাও তাই অসম্পূর্ণ। ফলতঃ উত্তরবঙ্গের উপভাষা সম্পর্কে বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনার প্রয়োজনীয়তা থেকেই গিয়েছে।

(উত্তরবঙ্গের উপভাষার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সবিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। বাংলা ভাষাতত্ত্বের আলোচনায়, প্রাচীন ও মধ্যবাংলার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে ভাষাতাত্ত্বিকদের নির্ভর করতে হয় প্রধানতঃ প্রাচীন ও মধ্যবাংলার কতিপয় সাহিত্যিক নিদর্শন, যথা-চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ইত্যাদির উপরে। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে সাহিত্যের ভাষা সর্বদেশে, সর্বকালে মুখের ভাষা থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। কারণ সাহিত্য-কর্মের ভাষায় স্রষ্টার ব্যক্তিত্ব, অলংকরণ এবং মার্জনার ছাপ পড়ে, এক্ষেত্রে মুখের ভাষাকে শিষ্ট ও সর্বজনীন রূপ দেওয়ার চেষ্টাও বরাবর থাকে। সুতরাং প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার উল্লিখিত নিদর্শনসমূহের ভাষা যে তৎকালীন বাংলাদেশের সাধারণ জনসমষ্টির মুখের ভাষা থেকে স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছিল একথা শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে হয়। ফলতঃ এই সমস্ত নিদর্শনের ভাষাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে প্রাচীন ও মধ্যবাংলার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের চেষ্টা যে অংশতঃ অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছে একথাও না মেনে উপায় থাকে না। বলা যেতে পারে যে প্রাচীন ও মধ্যবাংলার কথ্য বা মৌখিক নিদর্শনের অভাবই বাংলা ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় এই আংশিক অসম্পূর্ণতার মুখ্য কারণ।

এক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের উপভাষা এই মৌখিক বা কথ্য নিদর্শনের অভাব পূরণে সক্ষম। কারণ এই উপভাষা ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক কারণে বিবর্তনের একটি বিশেষ স্তর পর্যন্ত পৌঁছে আর অগ্রসর হতে পারেনি। ফলতঃ প্রাচীন ও মধ্যবাংলার অনুরূপ বহু উপাদান এই উপভাষায় এখনও বর্তমান।

আলোচ্য উপভাষাটিতে প্রাচীন ও মধ্যবাংলার নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ আমাদের দৃষ্টিতে পরিলক্ষিত হয়েছে -

প্রাচীন বাংলা

প্রাচীন বাংলার নিদর্শন বলতে একমাত্র চর্যাপদকেই বোঝানো হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে চর্যাপদের সঙ্গেই ধ্বনিগত ও রূপগত সাদৃশ্য প্রদর্শনের সূত্রে উত্তরবঙ্গের উপভাষায় প্রাচীন বাংলার বৈশিষ্ট্যসমূহ উদ্ধার করা হচ্ছে -

(১) ধ্বনিগত সাদৃশ্য

(ক) দন্ত্যধ্বনি এবং মূর্ধন্যধ্বনির পার্থক্য চর্যার যুগে সম্ভবতঃ ছিল না। অন্ততঃ চর্যায় অনুসৃত বানানরীতিতে দন্ত্য এবং মূর্ধন্যধ্বনির পার্থক্যের কোনো প্রমাণ নেই। যথা- ষাণ [illegible] এবং ষান [illegible] উত্তরবঙ্গের উপভাষাতেও দন্ত্য এবং মূর্ধন্যধ্বনির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই ('ধ্বনিতত্ত্ব'শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

(খ) চর্যায় প্রচুর পরিমাণে স্বরভক্তি বা মধ্যস্বরাগমের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আমাদের আলোচ্য উপভাষাটিতেও স্বরভক্তি প্রায় নিয়মিত ভাবে ঘটে থাকে। যথা- ধনতুলার্ ‹ধম্ম, ধড়তোর ‹ধর্ম ইত্যাদি।

(২) রূপগত সাদৃশ্য

(ক) চর্যায় 'সকল' ইত্যাদি বিশেষণ এবং 'জান', 'লোক' ইত্যাদি সমষ্টিবাচক শব্দ যোগে বহুবচনের রূপ গঠন করা হয়েছে। যথা- সকল সমাহিঅ, লোইনি জান ইত্যাদি। উত্তরবঙ্গের উপভাষাতেও এই পদ্ধতিতে 'ঘর্' ইত্যাদি যোগে বহুবচনের রূপ গঠিত হয়। যেমন- ছাওয়ার্ ঘর্ 'ছেলেরা', বাবুর্ ঘর্ 'বাবুরা', বাড়ুতালোর্ ঘর্ 'আমরা' ইত্যাদি।

(খ) পদের দ্বিরুক্তি দিয়ে বহুবচনের রূপ গঠন চর্যার আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বিশেষতঃ প্রথম পুরুষের এবং সাপেক্ষ সর্বনামের ক্ষেত্রেই এই জাতীয় প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন- জে জে আইলা, তে তে গেলা ইত্যাদি। উত্তরবঙ্গের উপভাষাতেও এই ভাবে প্রথম পুরুষের এবং সাপেক্ষ সর্বনামের ক্ষেত্রে পদের দ্বিরুক্তি দিয়ে বহুবচন জ্ঞাপন করা হয়। যেমন- জায়-জায় 'যারা', তায় তায়'তারা' ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে আলোচ্য উপভাষাটিতে 'জায়' এবং 'তায়', এই দুটি সর্বনামের ক্ষেত্রে পদের দ্বিরুক্তি ব্যতিরেকে বহুবচনের রূপ গঠন সম্ভব নয়।

(গ) গৌরবার্থে বহুবচনের প্রয়োগ চর্যায় বহুলদৃষ্ট। যথা - তুষ্টি পাদানাম, কুক্কুরি পাদানাম, ভুসুকু পাদানাম ইত্যাদি। উত্তরবঙ্গের উপভাষাতেও গৌরবার্থে সর্বদাই বহুবচনের প্রয়োগ ঘটে। যথা - তোমোরা 'আপনি', হামরা 'আমি', উমরা 'তিনি', বাবার্ ঘর্ 'বাবা' ইত্যাদি।

(ঘ) চর্যায় বিভিন্ন কারকে ব্যবহৃত বিভক্তিগুলি নিম্নরূপ -

কর্তৃ -	মুণা, এ	যথা - কুম্ভিরে খা, চোরে নিল	(চর্যা সংখ্যা - ২)
কর্ম -	ক	যথা - ঠাকুরক পরিনিবিত্তা	(চর্যা সংখ্যা -১২)
সম্প্রদান -	ক, লাই	যথা - মেরু শিখর লাই	(চর্যা সংখ্যা -৪৭)
সম্বন্ধ -	র	যথা - হরিণীর নিলয়	(চর্যা সংখ্যা - ৬)
অধিকরণ -	ত	যথা - হাড়িত ভাত নাহি	(চর্যা সংখ্যা -৩৩)

উল্লিখিত বিভক্তিগুলি উত্তরবঙ্গের উপভাষায় অভিন্ন ('রূপতত্ত্ব' শীর্ষক অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

(ঙ) স্ত্রীবোধক প্রত্যয়গুলি চর্যা এবং উত্তরবঙ্গের উপভাষা, উভয়তই অভিন্ন। যেমন-
চর্যা - শবর, শবরী (চর্যা সংখ্যা-৫০), [illegible], সুণ্ডিনী (চর্যা সংখ্যা -৩), [illegible]
উত্তরবঙ্গের উপভাষা - বাওটা, বাউটি 'পুরুষ, স্ত্রী', বামোন্, বামুনি 'ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী' ইত্যাদি।

(চ) উত্তরবঙ্গের উপভাষায় ব্যবহৃত 'মুই', 'তুই', 'মোর্' ইত্যাদি সর্বনামের ব্যবহার চর্যাতেও লক্ষ্য করা যায়। যেমন - মই (চর্যা সংখ্যা -১৮), মোর (চর্যা সংখ্যা -৪৩), তই (চর্যা সংখ্যা - ৩৯) ইত্যাদি।

(৩) পদবিন্যাসগত সাদৃশ্য

ক্রিয়ার আগে নঞর্থক অব্যয়ের ব্যবহার চর্যায় লক্ষ্য করা গিয়েছে। যেমন - ন জাই (চর্যা সংখ্যা-০৮), না জানুরে (চর্যা সংখ্যা - ৩২) ইত্যাদি। উত্তরবঙ্গের উপভাষাতেও নঞর্থক অব্যয়কে ক্রিয়ার আগে স্থাপন করে বাক্যের গঠন সম্পন্ন হয়। যেমন- ভাত্ না খাও্ 'ভাত খাই না', বাড়ি না জাও্ 'বাড়ি যাই না', তুই না আসুবু 'তুমি আসবে না' ইত্যাদি।

চর্যা পদে লিখিত বলে তার বাক্যবন্ধে প্রাচীন বাংলার পদবিন্যাসরীতির সম্যক পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব নয়। ফলে এই বিষয়ে উত্তরবঙ্গের উপভাষার সঙ্গে তার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের আলোচনায় এর বেশী অগ্রসর হওয়ার উপায় নেই।

মধ্যবাংলা

(১) ধ্বনিগত সাদৃশ্য

(ক) মধ্যবাংলার শেষ পর্বে, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে /ই/ এবং /উ/-এর অপিনিহিতি বহুল পরিমাণে ঘটে যেতে থাকে। এই অপিনিহিত স্বরধ্বনি দুটি অভিশ্রুতি জনিত ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে রূপান্তরিত হয়ে রাঢ়ী অঞ্চলের উপভাষায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কিন্তু মধ্যবাংলার আদি স্তরে অপিনিহিতি দেখা যায়নি। উত্তরবঙ্গের উপভাষাতেও অপিনিহিতি প্রায় নেই বললেই চলে। ফলতঃ অভিশ্রুতি, যা রাঢ়ী উপভাষার ক্ষেত্রে প্রচলিত, তা উত্তরবঙ্গের উপভাষায় ঘটেনি।

যেমন -

সং অদ্য > প্রাঃ অজ্জ > প্রাচীন ও মধ্যবাংলা আজি > রাঢ়ী আজ, কিন্তু উত্তরবঙ্গের উপভাষায় আজি।

সং দৃক্ষিত > প্রাঃ দেক্খিঅ > প্রাচীন বাংলা দেখিঅ > মধ্যবাংলা দেখিআ, দেখি, কিন্তু উত্তরবঙ্গের উপভাষায় দেখি বা দেখিয়া।

(খ) মধ্যবাংলায় অনেক ক্ষেত্রেই শ্বাসাঘাতের ফলে শব্দের আদিস্থিত হ্রস্বস্বর /অ/ দীর্ঘস্বর /আ/-তে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন- অপর > অবর > আবর, অভিনয় > আভিনয় মহাদান > মাহাদান ইত্যাদি। উত্তরবঙ্গের উপভাষাতেও শ্বাসাঘাত জনিত কারণে শব্দের আদিস্থিত /অ/ অনেক ক্ষেত্রেই /আ/-তে রূপান্তরিত হয়। যেমন - অবস্থা > আবোস্থা, মহাজন > মাহাজন, বড়া > বারা ইত্যাদি।

(গ) উত্তরবঙ্গের উপভাষার আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল পদান্তস্থিত স্বরধ্বনির দীর্ঘতা। এই বৈশিষ্ট্যটিও সম্ভবতঃ মধ্যবাংলা থেকেই অনুসৃত। যেমন- কুসুম > কুসুমা, কর্পটিক > কাপড়া, ডিম্বক > ডিমা ইত্যাদি।

(২) রূপগত সাদৃশ্য

(ক) 'ইল', 'ইব', প্রত্যয়ান্ত কৃদন্ত ক্রিয়াপদের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার মধ্যবাংলায় অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। উত্তরবঙ্গের উপভাষায় এই জাতীয় ব্যবহারের দৃষ্টান্ত প্রচুর। যেমন-

আসিল্ দিন্ 'আগত বা আসন্ন দিন'
দেখিল্ কাম্ 'দৃষ্ট বা উপস্থিত কার্য'
করিবা কাম্ 'কর্তব্য'
গেইল্ দিন 'বিগত দিন' ইত্যাদি।

(খ) প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত অধিকাংশ বিভক্তি মধ্যবাংলা স্তরে প্রায় অপরিবর্তিতই থেকে গিয়েছে। ফলে মধ্যবাংলায় প্রচলিত অধিকাংশ বিভক্তি উত্তরবঙ্গের উপভাষার সঙ্গে অভিন্ন (কারক, বিভক্তি পর্যায়ে এ সম্পর্কে বিশদ্ভাবে আলোচনা করা হয়েছে)।

(৩) পদবিন্যাসগত সাদৃশ্য

প্রাচীন বাংলার মত মধ্যবাংলাতেও নঞর্থক অব্যয় অনেক ক্ষেত্রে ক্রিয়ার আগে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের গঠন সম্পন্ন করেছে। যেমন- না জীবোঁ না জীবোঁ বিনি রাধা মরমদে (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, তাম্বুলখণ্ড)। উত্তরবঙ্গের উপভাষায় যে এই বৈশিষ্ট্য এখনও বর্তমান তা ইতোপূর্বে প্রাচীন বাংলার সঙ্গে আলোচ্য উপভাষাটির সাদৃশ্য প্রদর্শন সূত্রে উল্লিখিত হয়েছে।

প্রাচীন বাংলার মত মধ্যবাংলার নিদর্শনগুলিও প্রায় সমস্তই পদ্যে রচিত। তাই মধ্যবাংলার পদবিন্যাসরীতির সঠিক পরিচয় এই নিদর্শনগুলি থেকে পাওয়া যায় না। সুতরাং এক্ষেত্রেও মধ্যবাংলার

সঙ্গে উত্তরবঙ্গের উপভাষার পদবিন্যাসরীতির তুলনামূলক বিচারে বেশী দূর অগ্রসর হওয়ার সুযোগ নেই।

প্রাচীন ও মধ্যবাংলার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের উপভাষার এই তুলনামূলক বিচার মূলতঃ একটি সাদৃশ্যের উপরে ভিত্তি করে করা হ'ল। ব্যাপকতর অনুসন্ধান চালালে উল্লিখিত সাদৃশ্যসূত্রগুলি ছাড়াও সাদৃশ্যের আরও সূত্রের আবিষ্কার সম্ভব।

দেখা যাচ্ছে যে প্রাচীন ও মধ্যবাংলার উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি, যা আধুনিক বাংলার অধিকাংশ ক্ষেত্রে লুপ্ত, যা বাংলাভাষার ঐতিহাসিক উপাদানে পর্যবসিত, তা উত্তরবঙ্গের উপভাষার প্রাণবন্ত সজীব বৈশিষ্ট্য। এবং প্রাচীন এবং মধ্যবাংলার আরও অনেক বৈশিষ্ট্য উত্তরবঙ্গের উপভাষা থেকে আবিষ্কৃত হতে পারে, এমন সম্ভাবনাও আছে। সুতরাং এই উপভাষার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণে অগ্রসর হলে বাংলা ভাষাতত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রে মৌলিক বা কথ্য নিদর্শনের অভাবই শুধু দূর হবে না বা প্রাচীন ও মধ্যবাংলার অনেক অনাবিষ্কৃত বৈশিষ্ট্যের আবিষ্কারই শুধু সম্ভব হবে না, এর দ্বারা প্রাচীন ও মধ্যবাংলার সামগ্রিক পরিচয় তথা বাংলাভাষার বিবর্তনের ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠবে। সেদিক থেকে বাংলা ভাষাতত্ত্ব চর্চার কিছু অসম্পূর্ণতা বা অভাব অপসারণের জন্যই নয়, ঐতিহাসিক প্রয়োজনের তাগিদেও উত্তরবঙ্গের উপভাষার বিজ্ঞান সম্মত চর্চার প্রয়োজন আছে।

সমূহ কারণে উত্তরবঙ্গের উপভাষাকে বর্তমান গবেষণা নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই উপভাষা এবং তৎসংশ্লিষ্ট বাচকগোষ্ঠীর ইতিহাস অনুসন্ধান, উপভাষাটির ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব এবং পদবিন্যাসরীতির চরিত্র বিশ্লেষণ এই গবেষণা নিবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়।

উত্তরবঙ্গে একাধিক ভাষা-সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী উত্তরবঙ্গে সুপ্রাচীন কাল থেকে তিব্বত-চীনাভাষী কোচ-রাভা, মেচ ইত্যাদি সম্প্রদায়ের সঙ্গে ভারতীয় আর্যভাষী রাজবংশী, পলিয়া, পৌন্ড্র, জালিয়া, কৈবর্ত, মুসলমান ইত্যাদি সম্প্রদায় সহাবস্থানসূত্রে বসবাস করে আসছে। স্বাধীনতা পরবর্তী কালে দেশবিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে সংঘটিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লব ইত্যাদি কারণে বিপুল সংখ্যক হিন্দু উদ্বাস্তু উত্তরবঙ্গে এসে উপনিবিষ্ট হয়েছে। আগত এই বিপুল জনসমষ্টির যে অংশ রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া ইত্যাদি জেলার বাসিন্দা ছিল তাদের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ইত্যাদি সম্প্রদায়ের ভাষাগত বৈসাদৃশ্য প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু উল্লিখিত জেলাগুলি ছাড়া অন্যান্য জেলা থেকে আগত জনসমষ্টির দ্বারা বাহিত ভাষা স্পষ্টতই উত্তরবঙ্গের উপভাষা থেকে স্বতন্ত্র। অবশ্য সম্প্রতি আগত জনসমষ্টির এই অংশটিও ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি দিক থেকে উত্তরবঙ্গের পূর্বতন অধিবাসী রাজবংশী ইত্যাদি সম্প্রদায়ের সঙ্গে একাত্ম হতে চলেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই শ্রেণীর মানুষেরা নিজেদের পারিবারিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে যে ভাষা

ব্যবহার করে থাকে তার সঙ্গে পূর্বতন অধিবাসীদের মুখের ভাষার নানা বিষয়ে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। নৃতত্ত্ব বিচারে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত জনসমষ্টির এই অংশের ভাষাকে 'বঙ্গালী'-র অন্তর্ভুক্ত করা চলে। পক্ষান্তরে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী উত্তরবঙ্গের পূর্বতন অধিবাসীদের ভাষা ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে 'কামরূপী' উপভাষার অন্তর্গত।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে উত্তরবঙ্গে অন্ততঃ তিনটি বাক্-সম্প্রদায় বর্তমান। এই বাক্-সম্প্রদায়গুলি হ'ল (এক) তিব্বত-চীনাভাষী,(দুই) কামরূপী উপভাষাভাষী এবং (তিন) বঙ্গালী উপভাষাভাষী। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে দ্বিতীয়োক্ত বাক্-সম্প্রদায়ই উত্তরবঙ্গে জনসংখ্যার দিক থেকে সর্ববৃহৎ এবং তিব্বত-চীনাভাষী বৃহৎ বোড়ো গোষ্ঠীর অন্তর্গত কোচ-রাভা, মেচ ইত্যাদি সম্প্রদায়কে বাদ দিলে অধিবাসী হিসেবে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই সমীক্ষার ভিত্তিতে দ্বিতীয়োক্ত ভাষা-সম্প্রদায়ের ভাষা কামরূপীকেই আলোচনার বিষয় হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। বলাই বাহুল্য যে(উত্তরবঙ্গের উপভাষা বলতে ভাষা-তাত্ত্বিকরা কামরূপীকেই বুঝিয়ে থাকেন।)

উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলা ছাড়াও উত্তরবঙ্গের বাইরে আসামের গোয়ালপাড়া এবং কামরূপ জেলার কিছু অংশে, সাম্প্রতিক বাংলাদেশের রংপুর, দিনাজপুর এবং বগুড়া জেলার কিছু অংশে, নেপালের ঝাপা এবং মোরঙ্গ জেলার কিছু অংশে এবং বিহারের পূর্ণিয়া জেলার উত্তর-পূর্বাংশে কামরূপী উপভাষা প্রচলিত। ক্ষেত্র-সমীক্ষা এবং উপাদান সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশস্থ অঞ্চলসমূহ ছাড়া উল্লিখিত, কামরূপীভাষী সমস্ত অঞ্চলেই অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। এইভাবে সংগৃহীত উপাদানসমূহের যথাযথতা সম্পর্কে সংশয় দেখা দিলে কোনো কোনো অঞ্চলে একাধিকবার অনুসন্ধান চালিয়ে নিঃসংশয়িত হওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ এবং সংগৃহীত উপাদানসমূহের উপরে ভিত্তি করে, প্রধানতঃ বর্ণনামূলক (Descriptive) ভাষাতত্ত্বের সূত্র অনুসরণে, পূর্বসূরিদের মতামতকে যথাযথ মূল্য দিয়ে আলোচ্য উপভাষাটির ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, পদবিন্যাসরীতি এবং শব্দভাণ্ডার সম্পর্কে বিশদ্ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া উপভাষাটির এবং তার বাচকগোষ্ঠীর ইতিহাস, লিখিত বা সাহিত্যিক বাংলার সঙ্গে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য, তার অঞ্চল এবং সম্প্রদায় ভিত্তিক রূপবৈচিত্র্য ইত্যাদি বিষয়কেও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আলোচ্য উপভাষাটির নামকরণ সম্পর্কে বিতর্ক যেমন রয়েছে, তেমনি সেই বিতর্কের সমাধানও একটি আয়াসসাধ্য কাজ। উপভাষাটিকে ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুকুমার সেন প্রমুখ ভাষা-তাত্ত্বিকরা কামরূপী অভিধায় চিহ্নিত করেছেন। আবার কেউ কেউ হিসেবে স্যর জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন, ডঃ সুধীর কুমার করণ, ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী, শ্রী উপেন্দ্র নাথ বর্মণ প্রমুখ চিন্তাবিদরা এই উপভাষাকে একাধিক স্থানে 'রাজবংশী উপভাষা' বলে অভিহিত করেছেন। এক্ষেত্রে ভাষাতত্ত্বের নিরিখে বিচার করলে দুটি অভিধারই গ্রহণীয়তা বা বর্জনীয়তা সম্পর্কে সমান যুক্তি উত্থাপিত হতে পারে। যদিও যে নামটিকেই

গ্রহণ করা হোক না কেন, ভাষাতত্ত্বের বিচারে তা প্রমাণিত হবে না। অবশ্য এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলে কোনো ভাষা বা উপভাষার জন্যই সমস্ত প্রকার বিতর্কের অতীত, উপযুক্ত কোনো অভিধা শেষ পর্যন্ত হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না। পরন্তু বিষয়টি সামাজিক ভাষাতত্ত্ব (socio-linguistics) -এর এলাকাভুক্ত। একারণে নামকরণ সম্পর্কিত বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে, বাংলা উপভাষাসমূহের বিভাজনের ক্ষেত্রে অনুসৃত আঞ্চলিক বা ভৌম কাঠামোর গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়ে, বর্তমান নিবন্ধে আলোচ্য উপভাষাটিকে 'উত্তরবঙ্গের উপভাষা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বলাই বাহুল্য, এই জাতীয় উল্লেখ উপভাষাটির নামকরণের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র কোনো অভিমতের দ্যোতক নয়।

বর্তমান গবেষণা-কর্মটি আমার একক প্রচেষ্টার ফল, একথা বললে ভুল হয়। শুভানুধ্যায়ী বহু মানুষের সহযোগিতা এবং উৎসাহে এই গবেষণা প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। এতদঞ্চলের রাজবংশী সমাজের মানুষের কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রথমেই জ্ঞাপন করি। কেননা, এই ভাষায় গবেষণার ব্যাপারে এই সমাজের মানুষের নৈকট্য, সহযোগিতা এবং স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ আমার প্রধান প্রেরণার উৎস।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ পুলিন দাস, নির্দেশক হিসেবে গবেষণা-কর্মের প্রতিটি স্তরে অমূল্য পরামর্শ এবং নির্দেশ দিয়ে আমাকে অশেষ ঋণপাশে আবদ্ধ করেছেন। এই ঋণ বিনিময়-মূল্যে পরিশোধ্য নয়।

এই বিষয়ে সহযোগিতা পেয়েছি বিভাগীয় অন্যান্য অধ্যাপকদের কাছেও। বিশেষতঃ অধ্যাপক ডঃ প্রণয় কুমার কুণ্ডু মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনা করে নানা বিষয়ে উপকৃত হয়েছি। এই বিভাগেরই প্রাক্তন অধ্যাপক পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত তরুণীকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয় শারীরিক অক্ষমতা সত্ত্বেও গবেষণাপত্রটির আদ্যন্ত পাঠ করে ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে, গবেষণা-কর্মের দুর্বলতা অতিক্রম করতে যেভাবে সাহায্য করেছেন, তা এক কথায় বিস্ময়কর। তাঁর প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

গবেষণা-প্রচেষ্টায় অনেক সময় নানা সমস্যা ও জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের বর্তমান প্রধান-অধ্যাপক ডঃ সুভাষ চট্টোপাধ্যায় এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষাসমূহের প্রবীণ অধ্যাপক ডঃ শিশির দাশ মহাশয়দ্বয়ের সহৃদয় আনুকূল্য ও সহযোগিতায় এই সমস্ত সমস্যা ও জটিলতার অনেকখানি নিরসন ঘটেছে। এঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

দিনহাটা মহকুমার অধিবাসী সংস্কৃত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রভাত সিংহ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর নিজস্ব ব্যাকরণ বিষয়ক গবেষণা-কর্মের পাণ্ডুলিপি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন আর আমাদের বিলাসীপাড়া

কলেজের অধ্যাপক ডঃ রেবতীমোহন সাহা সরবরাহ করেছেন তাঁর নিজস্ব মূল্যবান গ্রন্থাদি। এঁদের দু'জনকেই আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

স্মরণ করি আমার পরম শ্রদ্ধেয়া পিতামহী শ্রীমতী কুঞ্জসুন্দরী দেবীকেও। তাঁর স্মৃতিসংরক্ষিত, এই উপভাষার অধুনালুপ্ত উপাদানসমূহ আমার গবেষণা-কর্মের মূল্যবান সহায়ক হয়েছে। এই সহযোগিতার জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের প্রশ্ন একান্তভাবে অবান্তর। কেননা, তাঁর কাছে আত্মীয়তার মূল্য আনুষ্ঠানিক কৃতজ্ঞতার চেয়ে অনেক বেশী।

ক্ষেত্র-সমীক্ষার কাজে ঋণী করেছেন উত্তরবঙ্গের বাইরেও আসাম, নেপাল ও বিহারের গ্রামগঞ্জের অগণিত মানুষ। তাঁদের আশ্রয়, সাহায্য ও সহযোগিতা না পেলে এই গবেষণা-কর্মের বাস্তবায়ন সম্ভব হত না। শুধু গবেষণার ব্যাপারেই নয়, জীবনের ব্যাপারেও তাঁদের প্রত্যক্ষ স্পর্শে আমি উদ্দীপনা অনুভব করেছি।